শঙ্খ ঘোষ

তথাগত দাশগুপ্ত

সাক্ষাৎকার

১। প্রেসিডেন্সি কলেজে আপনি যে কালে পড়েছেন, সে কালের সাহিত্যের পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলুন। কারা পড়াতেন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, পাঠদানের স্টাইল – এগুলি জানতে ইচ্ছে করে আমাদের।

প্রেসিডেন্সিতে আমি পড়েছি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তার পরে এম.এ. পড়বার সময়েও কলেজের সঙ্গে নিয়মিত যোগ ছিল। তবে শুধু সেইটুকুই নয়, আমাদের কাল বলতে ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গণ্য করা চলে।

আমার সাম্মানিক বিষয় ছিল বাংলা। কিন্তু সেই সঙ্গে কলেজে ইংরেজি আর সংস্কৃত সাহিত্যও পড়তে হয়েছে কিছুটা। সাহিত্যপাঠের কোনো একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি দিয়ে এই তিনটেকেই বোঝানো যায় না। এমনকি এও বলা যায় যে, শুধু ভাষাভেদেই নয়, ব্যক্তিভেদেও পদ্ধতিভেদ হয়ে যেত। সাধারণভাবে বলতে পারি, বাংলা পড়ানোর পদ্ধতিটা আমার কাছে বিশেষ সুখজনক অভিজ্ঞতা ছিল না। অধিকাংশ মাস্টারমশাই পাঠ্য বইটি কখনো আবেগ দিয়ে, কখনো নিরাবেগে শুধু পড়েই যেতেন ক্লাসে। আর মাঝেমাঝে তারিফ করতেন। সেই আবৃত্তিটাকেই তাঁরা পড়ানো ভাবতেন। পুরোনো কালে এ পদ্ধতিটার যে বেশ প্রচলন ছিল, তা বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি একবার বলেছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মশাই কীভাবে কোনো শ্লোক পড়ে 'আহা! আহা!' করে উঠতেন। আমাদের মাস্টারমশাই জনার্দন চক্রবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী পড়াতেন প্রায় ঐ ভঙ্গিতেই। সেই সঙ্গে অবশ্য আরেকটা মজার ব্যাপারও ছিল। পাঠ্যাংশের কোনো একটি দুটি লাইন তাঁর কাছে অশ্লীল বলে মনে হলে সে অংশটি বাদ দিয়ে দিতেন। যেমন 'রাজা ও রাণী' পড়াবার সময়ে প্রথম দৃশ্যে দেবদত্তের সংলাপ 'কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে' লাইনটিকে টপকে তিনি চলে যেতেন পরের অংশে। তাতে যে অর্থবোধ হচ্ছে না, সেটাও গ্রাহ্য করতেন না। এসবের ব্যতিক্রম ছিলেন না কেউ, তা নয়। হরপ্রসাদ মিত্র তখন কবি বলে পরিচিত। দেবীপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যপাঠের একটা যোগ ছিল। এঁদের পড়ানোতে মাঝে মাঝে সেই রেশটা চলে আসতো। মনে আছে, প্রশ্নোত্তরে আমার একটি শব্দব্যবহার ছিল 'অন্বিষ্ট'। দেবীবাবু ক্লাসে বলেছিলেন – 'তার মানে তুমি বিষ্ণুবাবুর নতুন বইটা পড়েছ'। কথাটা ছিল সত্যি। আর এর ফলে অন্য একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হতো। হরপ্রসাদ মিত্রও কখনো কখনো আধুনিক সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলে কথা বলতে চাইতেন। ভালো লাগতো সেটা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যপাঠের যথার্থ কোনো নতুন দিশা তখনো পর্যন্ত তৈরি হয়ে ওঠেনি মনে হয়।

উল্টো ছিল ইংরেজিতে। তারকনাথ সেনের মতন কোনো শিক্ষকের কাছে পড়তে পাওয়া – এটা বেশ ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে হতো। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে তিনি আমাদের টিউটোরিয়াল নিতেন – এক এক দলে তিনজন। কিন্তু প্রথম ক্লাসটা হয়েছিল ১০টা গ্রুপের ৩০ জনকে নিয়ে। সেই ক্লাসে তিনি জানিয়েছিলেন, কী পদ্ধতিতে টিউটোরিয়াল হবে। বোর্ডে ১৫-১৬টি চিহ্ন এঁকে তার পাশে পাশে কিছু লিখলেন। আর আমাদের তা লিখে নিতে বললেন। চিহ্নগুলি নানারকম ভুলের সূচক। যেমন – বানান ভুল, প্রিপজিশনের ভুল, অন্বয়গত ভুল, শব্দব্যবহারগত ভুল ইত্যাদি। তাঁর পদ্ধতিটা হবে এইরকম : আমাদের কিছু লিখতে দেবেন, সেই লেখাটা তাঁকে দেবো, তিনি শুধু নানা জায়গায় নানা চিহ্ন বসিয়ে সেটা আমাদের ফেরৎ দেবেন, আর চিহ্ন অনুযায়ী আমাদের নিজেদেরই পরিশোধন বা পরিমার্জন করে তাঁকে আবার দিতে হবে এবং তখন তিনি নম্বর বসাবেন। এইভাবে সংশোধন নিজেই করে নেবার একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়েছিলাম। বি.এ. ক্লাসে তাঁর কাছে পড়েছিলাম শেক্সপীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'। অনার্স তো নয়, নিতান্তই পাশ ক্লাস, কিন্তু তাতেও উনি যেভাবে পড়াতেন, তাতে আমাদের জানতে হতো শেক্সপীয়রের ফোলিও পাঠ আর কোয়ার্টো পাঠের পার্থক্যের বিষয়। মজা লাগতো এই জেনে যে, কীভাবে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লিখতে লিখতে হঠাৎ একটা রাইমড কাপলেট চলে আসত দৃশ্যশেষ বোঝাবার জন্য। টেক্সট বিচার যে কীভাবে করতে হয় এবং একজন লেখকের সঙ্গে তাঁর সময়ের সংযোগটা কীভাবে জানতে হয়, এইসবেরই একটা শিক্ষা হতো তাঁর ক্লাসে। ইংরেজির ভালো শিক্ষক ছিলেন আরও কয়েকজন – সোমনাথ মৈত্র, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ মুখোপাধ্যায় আর সদানন্দ চক্রবর্তী। কিন্তু এঁদের পড়ানোর ধরণটা – অন্তত পাস ক্লাসে – খুব যে গভীরে নিয়ে যেত তা নয়, যদিও তাঁদের পাণ্ডিত্যের পরিমাণটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হতো না।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

আমার আড্ডা ছিল প্রধানত কফি হাউস। তখন মুখে মুখে একটা কথা চলতো – কফি হাউস হলো প্রেসিডেন্সি কলেজের কমনরুম। সেখানে নিতান্ত খোশগল্প যেমন হতো, তর্কাতর্কি বা নানা বিষয়ের পরিকল্পনা – এসবও ঘটতো অনেক।

আর অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিলাম গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতো একজন যথার্থ পণ্ডিতের কাছে। আমাদের তখন পড়তে হতো গীতার দুটি অধ্যায় বা রঘুবংশম বা ভট্টিকাব্যম। রঘুবংশমের প্রথম শ্লোক –

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।।

এই শ্লোকটি থেকে বাক্ এবং অর্থের সম্পর্ক আর তার সঙ্গে পার্বতী-পরমেশ্বরের সম্পর্ক কীভাবে এক হয়ে গেল, এই নিয়েই গোটা একটা ক্লাস কথা বলেছিলেন তিনি। আর গীতার ক্লাসে আমাদের পরবর্তীকালীন দর্শনপাঠের একটা প্রাথমিক সূচনা হয়ে যেত। সেই সূচনায় ছাত্রশিক্ষকের পারস্পরিক কথা বলার এবং তর্ক করারও বেশ বড় একটা পরিসর ছিল।

২। ওঁর কাছে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' পড়ার অভিজ্ঞতাটা বললেন না?

হ্যাঁ, তা বলিনি, কেননা সেটা ছিল বি.এ. ক্লাসের সময়ে। তখন সংস্কৃত আমার বিষয় ছিল না। কিন্তু বিষয় না থাকলেও যেমন সুশোভন সরকারের ফরাসি বিপ্লবের ক্লাস না শুনে পারা যেত না, তেমনই আমার মনে হয়েছিল গৌরীনাথ শাস্ত্রীর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর ক্লাসও না শুনে পারবো না। তাই অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে দু'এক দিন সেই ক্লাস শুনবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ক্লাস শেষে মাস্টারমশাই মজা করে বলেছিলেন – 'যাও, পড়ো আরও বাংলা!' অভিমানভরা সেই তর্জন আমার বেশ ভালোই লেগেছিল।

৩। বাংলা পড়ানোর ক্ষেত্রে যা বললেন, তার থেকে কি আলাদা ছিল না ক্ষুদিরাম দাসের পড়ানোর ধরন?

না, একেবারেই আলাদা ছিল না। তিনিও প্রধানত পড়ে যেতেন এবং দু'চারটে মন্তব্য করতেন। এঁদের কিন্তু পাণ্ডিত্যের কোনো অভাব ছিল না। একটা সমস্যা হলো, সব জ্ঞানী মানুষ ক্লাসে সফল শিক্ষক হন না। একবার আমার একটি লেখা পড়ে তিনি যখন ফেরৎ দিয়েছিলেন, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লাল কালিতে চিহ্নিত ছিল, আর পাশে পাশে মর্মবিদারক কিছু মন্তব্য ছিল। একটি যেমন : আমার লেখায় ছিল 'প্রাচীনকালের ঋষি বলেছেন', শব্দক'টিতে লাল চিহ্ন দিয়ে মার্জিনে লিখেছিলেন 'কোন ঋষি? চালাকি কোরো না।' রক্তলাঞ্ছিত সেই খাতা ফেরৎ পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে সাব্যস্ত করি যে এ কলেজ ছেড়ে দেবো। আমার সেই 'ভয়ানক' ইচ্ছের কথা জানতে পেরে দেবীবাবু এসে পিঠে হাত বুলিয়ে নিবৃত্ত করেছিলেন। কিন্তু অল্প পরে আমি বুঝতে পারি ক্ষুদিরামবাবুর সেই মন্তব্যের সবগুলিই খুব যথার্থ ছিল, শিক্ষার পক্ষে ফলপ্রদ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদিরাম দাসের কাছে অনেকটাই শিখতে পেরেছি আমি ক্লাসের বাইরে। যেখানে তিনি থাকতেন, সেখানে অনেক সময়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি আর দেখেছি বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত তিন রকমের সাহিত্যেই তাঁর অবাধ চলাচল। কিন্তু ক্লাস পড়ানোর ক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রতিফলন থাকত না।

ক্লাসের বাইরে যোগাযোগের প্রসঙ্গে মনে পড়ে আরও একজন মাস্টারমশাই শ্রীশচন্দ্র দাশের কথা। উনি শাক্ত পদাবলী পড়াতেন। সহপাঠী বন্ধু প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য দু'একটি প্রশ্ন করলে উদ্দীপ্ত হয়ে তন্ত্রশাস্ত্র নিয়ে কিছু বলতেন। সেটি যথেষ্ট মনে না হওয়াতে প্রদ্যুম্ন চলে যেত তাঁর বাড়িতে। ফিরে এসে বলতো – তন্ত্রে কী গভীর জ্ঞান সেই মানুষটির!

তরুণতর দু'জন অধ্যাপকের নাম বলেছি আগে, যাঁরা পরে বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছিলেন – হরপ্রসাদ মিত্র আর দেবীপদ ভট্টাচার্য। টেক্সটকে টেক্সটের বাইরে নিয়ে যেতে দেবীবাবুর কিছুটা প্রবণতা ছিল। তবে তিনি তখন সবে শুরু করেছেন। পরে তাঁর বিস্তার আর গভীরতা অনেক বেড়েছিল, যখন আমাদের ঠিক পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে এসে যুক্ত হলেন ভবতোষ দত্ত আর ভূদেব চৌধুরীর মতন গুণী অধ্যাপকেরা কিংবা চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর মতো প্রবীণ জ্ঞানী।

৪। আপনার সমসাময়িক ছাত্রদের কথা জানতে ইচ্ছে করে। কেমন ছিল সে-সময়ের কলেজের সংস্কৃতি? ক্যান্টিনের পরিবেশ? কফি হাউসের আড্ডা?

ক্যান্টিনের পরিবেশ বিষয়ে আমি তেমন কিছু বলতে পারবো না, কেননা অতদিনের মধ্যে একদিনের বেশি ক্যান্টিনে আমি ঢুকিনি। আমার আড্ডা ছিল প্রধানত কফি হাউস। তখন মুখে মুখে একটা কথা চলতো – কফি হাউস হলো প্রেসিডেন্সি কলেজের কমনরুম। সেখানে নিতান্ত খোশগল্প যেমন হতো, তর্কাতর্কি বা নানা বিষয়ের পরিকল্পনা – এসবও ঘটতো অনেক। আমি খুব কাছাকাছি থাকতাম বলে অনেক সময়ে সাত-আট ঘন্টাও কাটিয়েছি একটানা কফি হাউসে। তবে সবাই যে সেখানে আসতো, তা নয়। যেমন আমাদের বন্ধু, ইংরেজির অরুণকুমার দাশগুপ্ত, যাকে পরে বলা হতো তারকনাথ সেন আর অমল ভট্টাচার্যের ধারাবাহী, সেই অরুণ কোনোদিন কফি হাউসে আসবে, এটা কল্পনাও করা যেতো না। কিংবা আমাদের বন্ধু প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য। উল্টোদিকে দর্শনের শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইতিহাসের হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অর্থনীতির কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী – যারা সবাই পরে নিজের নিজের বিষয়ে দিকপাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে – তারা তখন মশগুল থাকত কফি হাউসে। আমাদের কিছুকাল আগে পড়েছেন যে অম্লান দত্ত, তাঁকে প্রায়ই দেখতাম একটা কোণে তরুণতরদের নিয়ে বসে কথা বলছেন,

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

আলোচনা করছেন। অর্থাৎ কফি হাউস তখন নিছক আড্ডাস্থলই ছিল না, আলোচনার একটা কেন্দ্রভূমিও হয়ে উঠেছিল।

সাহিত্য-সংস্কৃতির বেশ একটা সজীবতাই তখন ছিল কলেজে। নিয়মিত বেরোত দেওয়াল-পত্রিকা। আর সে পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা নিয়ে মাস্টারমশাইরাও কখনো কখনো কথা বলতেন। তখনকার কলেজ ম্যাগাজিনের মানও ছিল বেশ উন্নত। সম্পাদনার দায়িত্ব থাকতো বি.এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের। আমাদের আগের বছরে যেমন ছিল শিপ্রা সরকার, আমাদের বছরে অরুণকুমার দাশগুপ্ত, পরের বছরে অশীন দাশগুপ্ত – এইভাবে চলতো প্রক্রিয়াটা। আর ছিল বিভাগীয় সব সেমিনার : আজকালকার অর্থে সেমিনার নয়। বিভাগীয় ছেলেমেয়েরা সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকভাবে একসঙ্গে মিলতো আর কোনো-না-কোনো বিষয়ে আলোচনা বা পাঠ চলতো। এছাড়া কখনো আবার বাইরে থেকে কোনো বিশেষ মানুষকে আহ্বান করে আনা হতো বক্তৃতার জন্য। আমরা যেমন একবার নিয়ে এসেছিলাম অতুলচন্দ্র গুপ্তকে। তাঁকে তিনতলায় তুলতে হয়েছিল ইনভ্যালিড্ চেয়ারে। কিন্তু তবু তিনি এসেছিলেন আর অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। এও একটা সুখস্মৃতি। ছাত্র ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে ডেকে আনা হতো পঙ্কজ মল্লিক আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে একসঙ্গে। আর তারও চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা লাইব্রেরি ঘরের নিচু পাটাতনের উপর বহুরূপীর নিরাভরণ 'বিভাব' নাটকটির অভিনয়ের কথা। তখনও পর্যন্ত সে নাটক কিন্তু কলকাতার আর কেউ দেখেনি। লাইব্রেরি ঘরের কথায় মনে পড়লো অন্য একটা ছবি – বই নিয়ে সেখানে পড়ছে ছেলেমেয়েরা, কিন্তু হয়তো দু'চারজন সেই সঙ্গে গল্পগুজবও করছে। হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়ালেন তারকনাথ সেন। নিচু গলায় বললেন – 'এটা ঠিক গল্প করার জায়গা নয়'। উনি মাঝেমাঝেই এরকম তদারকি করে যেতেন লাইব্রেরিতে।

৫। ছাত্রদের প্রতিভা, পরিশ্রম, মেধা, সমাজ ও জীবনবোধ কেমন ছিল সে-কালে?

সেসময়ে ধরে নেওয়া হতো, সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সুযোগ পায়। দু'চারজন ব্যতিক্রম থাকতো না, তা নয়। কিন্তু সাধারণ সত্যটা ছিল ওইরকম। তখনকার দিনে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রথম ২০-২৫ জন যারা থাকতো, তারা প্রেসিডেন্সিতে পড়বে না – এটা ভাবাই যেতো না! একটা তথ্য এখানে মনে রাখা ভালো – এখন যেমন ভালো ছাত্রছাত্রীদের প্রথম লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়ায় ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া, সে সময়টায় কিন্তু তার একেবারে উল্টো ছিল। হিউম্যানিটিজ বা সায়েন্স – সেটাই ছিল প্রথম নির্বাচন। মেধা বিষয়ে একটা গল্প বলি। গৌরীনাথ শাস্ত্রীর প্রথম ক্লাসে নাম ডাকার পরেই প্রতিটি ছেলেকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন সংস্কৃতে কে কত পেয়েছে। দেখা গেল দু'জন পেয়েছে ৭৭ আর ৭৮। সবার সামনেই ক্লাসে তিনি বললেন – 'তোমরা দু'জন সংস্কৃত ছেড়ে অন্য বিষয় নাও'। শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম! ঠিক এইরকমই একটা কাহিনী আছে তারকনাথ সেনের ক্লাস বিষয়ে। অনার্সের প্রথম ক্লাসে কিছু লিখতে দিয়ে ছেলেমেয়েদের খাতার পাশে প্রায়ই তিনি লিখতেন – 'দ্রুত অনার্স পাল্টাও'। এ তো গেল মেধার কথা। কিন্তু পরিশ্রমী যে সবাই খুব ছিল, তা মনে হয় না। শুধু ক্লাস ফাঁকি দেওয়া নয়, দিনের পর দিন পড়াশুনোয় অবহেলা করতেও অনেককেই দেখেছি। পরে তারা কিন্তু সকলেই বড়োরকম সাফল্য নিয়েই উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই ব্যক্তিভেদে অভিজ্ঞতাভেদ ঘটে। আমাদের কয়েক বছর পরের অর্থনীতির বিশিষ্ট পণ্ডিত ছাত্র তরুণ দত্তের লেখায় পড়েছি যে পড়াশুনোর বিপুল চাপে অন্য কোনো সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের কথা নাকি তাঁরা ভাবতেই পারতেন না।

সেসময়ে ধরে নেওয়া হতো, সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সুযোগ পায়। দু'চারজন ব্যতিক্রম থাকতো না, তা নয়। কিন্তু সাধারণ সত্যটা ছিল ওইরকম। তখনকার দিনে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রথম ২০-২৫ জন যারা থাকতো, তারা প্রেসিডেন্সিতে পড়বে না – এটা ভাবাই যেতো না!

আর সমাজবোধ জীবনবোধের কথায় বলি – পড়াশুনোর বাইরেও একটা সামাজিক দায়বোধ থেকে ছোটো ছোটো কিছু সংগঠন গড়ে তোলা, যে সংগঠনে একটা সৃষ্টিভাবনা কাজ করে, এটা তখনকার একটা অভ্যেসের অন্তর্গত ছিল। প্রদ্যুম্নর নেতৃত্বে আমরা যেমন গড়ে তুলেছিলাম একটা 'প্রগতি-পরিষদ'। বাইরের নানা গুণীজনকে আহ্বান করে তাঁদের কাছে সমাজ বা সাহিত্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করা বা কিছু প্রশ্ন তোলা আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক কোনো উগ্রতা ছিল না, কিন্তু রাজনৈতিক একটা বোধ ছিল। সে আমলে কলেজের একটা বিরাট আকর্ষণ ছিল বেকার ল্যাবরেটরিতে মাঝেমাঝেই কোনো বিতর্কসভার আয়োজন। বাইরে থেকে সে বিতর্কে অংশ নিতে আসতেন অম্লান দত্ত বা সুধাংশু দাশগুপ্ত বা বিশ্বনাথনের মতো খ্যাতিমান তার্কিকেরা এবং আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম এসব বিতর্কসভার জন্য।

৬। রাজনীতি, সাহিত্য, কাব্যবোধ, সাহিত্যের রুচিপছন্দ – এসব বিষয়ে কলেজের থেকে তৈরি হওয়া কোনো মূল্যবোধ বা প্রেরণার কথা কি মনে হয় আপনার?

এতক্ষণ যা কিছু বললাম, সেটাকে একটা প্রেরণা বলা যেতেই পারে। আর তারই থেকে একটা মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। ক্লাসের বাইরে বা এমনকি ভিতরেও অনেক শিক্ষকের সঙ্গে অনেক ছাত্রের যে ধরণের সংযোগ ঘটতো, বা মাস্টারমশাইদের চালচলনে যে ধরণের সম্ভ্রান্ততা থাকতো, তার থেকে বিদ্যাজগৎ বিষয়ে একটা শ্রদ্ধার বোধ তৈরি হতে পারতো। দর্শনের ক্লাসে গোপীনাথ ভট্টাচার্যের পড়ানোর মধ্য দিয়েই জীবন বিষয়ে গভীরতর সন্ধানের একটা আগ্রহের সঞ্চার হতো।

সামান্য ঘটনাও কীভাবে অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, তার দু'একটা

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

একটা সময়ে ভাবা হয়েছিল যে প্রেসিডেন্সিতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকেরা থাকবেন আর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পড়বে। কিন্তু পরে একটা সময়ে, এই বিধিটাকে অন্যায্য মনে করে শ্রেষ্ঠত্বের এই ধারণাটিকে খারিজ করা শুরু হয়। একটা ভুল অর্থে সাম্যতন্ত্র বা গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় শিক্ষাজগতে। আর আমার ধারণা সেই থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজের অবনমনের সূত্রপাত।

উদাহরণ বলি। তিনতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে আমি নামছি, আর দোতলা থেকে উঠে আসছেন গোপীনাথবাবু। মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি সরে গেলাম ডানদিকে, কিন্তু উনিও সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে সরে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই আমার মুখোমুখি হলেন। বললেন – 'পরীক্ষা তো প্রায় এসে গেল। পড়াশোনা একটু করছো? নাকি শুধু সাহিত্যই করছো?' আমার মুখে কথা জোগালো না। দর্শন আমার সাম্মানিক বিষয় ছিলো না। আমার বিষয়ে এতটা দায়বোধ ওঁর থাকবার কথা নয়। কিন্তু ওইভাবে স্মিতমুখে 'ক'দিন একটু পড়ো' বলে উনি যখন উঠে গেলেন, আমার মনে হচ্ছিলো যেন পুনর্জন্ম ঘটছে। কিংবা অন্য আরেক অভিজ্ঞতা দেবীপদ ভট্টাচার্যকে নিয়ে। পরীক্ষা থেকে পালানোর একটা অভ্যেস ছিলো আমার। একবার পরীক্ষার ঘরে না দেখে, দেবীবাবু গোটা কলেজ আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিলেন কলেজ স্ট্রিট–হ্যারিসন রোডের মোড়ে, সেখানে থেকে জোর করে ধরে নিয়ে পরীক্ষায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনঘন্টার পরীক্ষা দু'ঘন্টায় দিতে হলো। কিন্তু দিতে দিতেই মনে হচ্ছিলো, ছাত্র বিষয়ে শিক্ষকের এইসব দায়বোধ বা মমত্ববোধ কতটাই–না কাজ করতে পারে অল্পবয়সের কোনো মনে। এসব থেকেই একদিন তৈরি হতে পারে কোনো মূল্যবোধ।

৭। আজকের বিবর্তমান প্রেসিডেন্সির দিকে তাকিয়ে আপনার কি কোনো আশা বা নিরাশার কথা মনে হয়?

এক হিসেবে এর উত্তর দেওয়াটা বোধহয় অন্যায় হবে, কেননা আজকের প্রেসিডেন্সিকে প্রত্যক্ষভাবে আমি জানি না। তবু সাধারণভাবে একটা কথা বলতে পারি। একটা সময়ে ভাবা হয়েছিল যে প্রেসিডেন্সিতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকেরা থাকবেন আর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পড়বে। কিন্তু পরে একটা সময়ে, এই বিধিটাকে অন্যায্য মনে করে শ্রেষ্ঠত্বের এই ধারণাটিকে খারিজ করা শুরু হয়। একটা ভুল অর্থে সাম্যতন্ত্র বা গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় শিক্ষাজগতে। আর আমার ধারণা সেই থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজের অপনয়নের সূত্রপাত। জ্ঞানের জগতে বা বিদ্যার জগতে উৎকর্ষের ধারণাটাকে লুপ্ত করা সম্ভব নয়। আর এই মুহূর্তে কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত হওয়ার সময়ে টলোমলো অবস্থাটা বাইরে থেকেও খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। তবে সবসময়েই আশা করতে ইচ্ছে হয় যে, কোনো একদিন এই অবস্থা থেকে পুনরুত্থান হয়তো সম্ভব হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সন্দীপন চক্রবর্তী

''এই সাক্ষাৎকার যখন নেওয়া হয়, তখনও আমরা এই সুসংবাদ পাই নি যে শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ ২০১৬ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যদিও এই সম্মান তাঁর অনেক আগেই প্রাপ্য ছিল, তবুও আমরা কবির এই সম্মানপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত গর্বিত।''

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073